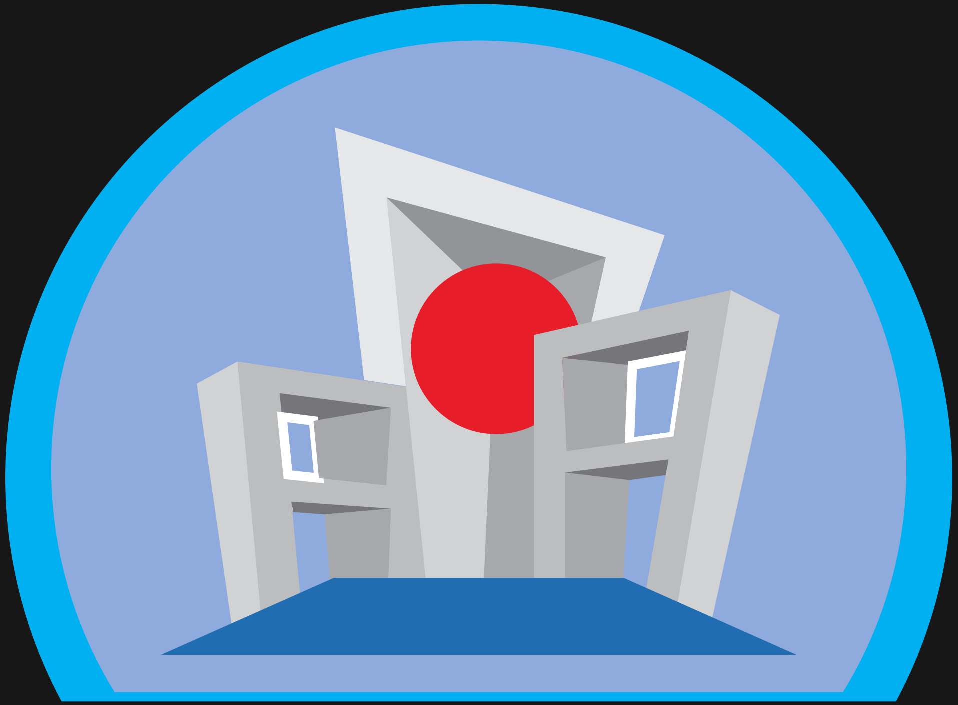

বাংলা ১ম পত্র

একাডেমিক এন্ড প্রি-এডমিশন প্রোগ্রাম-২৫

ফোকাস
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং

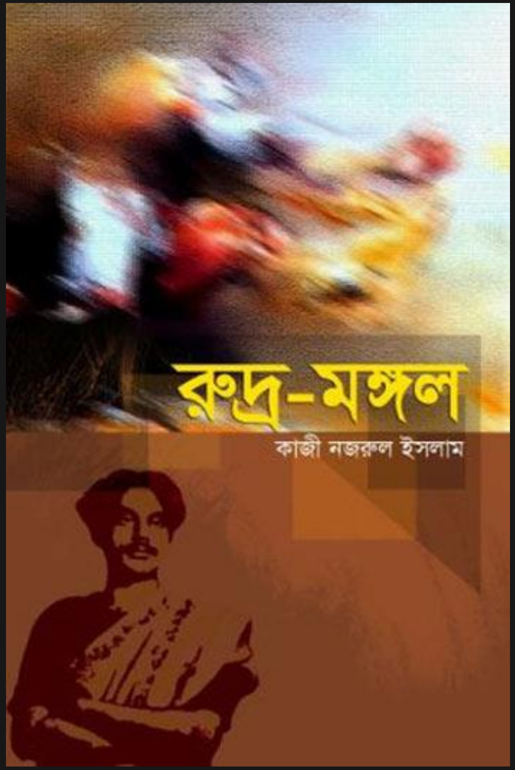

আমার পথ

কাজী নজরুল ইসলাম

(২৪ শে মে ১৮৯৯ – ২৯ শে নভেম্বর ১৯৭৬)

ফোকাস
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং

খ্রিষ্টাব্দ

লেখক-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) জন্মগ্রহণ করেন তাঁর বাবার নাম কাজী ফকির আহমেদ, মায়ের নাম জাহেদা খাতুন।

সত্য প্রকাশের দুরন্ত সাহস নিয়ে নজরুল আমৃত্যু সকল অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার, প্রতিবাদী। এজন্য বাংলা সাহিত্যের 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। আবার একই সঙ্গে কোমল দরদি মন নিয়ে ব্যথিত বঞ্চিত মানুষের পাশে থেকেছেন তিনি।

আমার পথ

1. ধূমকেতু
2. লাঙল
3. নবযুগ

এক হাতে বাঁশি আরেক হাতে রণতূর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন নজরুল; আর এসেই প্রচলিত শিল্পধারাসমূহকে পাল্টে দিয়ে নতুন বিষয় ও নতুন শব্দে বাংলা সাহিত্য ও সংগীতকে করেছেন সমৃদ্ধতর। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া নজরুলের কর্মজীবনও ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। মসজিদের ইমামতি, লেটোর দলে যোগদান, ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগদান, সাম্যবাদী ধারার রাজনীতি, পত্রিকা সম্পাদন কিংবা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়াসহ বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবন ছিল পূর্ণ। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় এই ঋদ্ধ ও সম্ভাবনাময় জীবন আমৃত্যু নির্বাক হয়ে যায়

এর কিছুকাল পরে কবির মৃত্যু হলে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হয়। কবি হলেও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও তিনি বিচরণ করেছেন তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে 'বাঁধনহারা', 'মৃত্যু-ক্ষুধা', 'কুহেলিকা' এবং গল্পগ্রন্থের মধ্যে 'ব্যথার দান', ' রিক্তের বেদন', 'শিউলিমালা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) 'যুগ-বাণী', ' দুর্দিনের যাত্রী', 'রুদ্র-মঙ্গল', 'রাজবন্দির জবানবন্দি' তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ।কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ শে আগস্ট (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

মূল প্রবন্ধ

আমার পথ

আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা-শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি- নমস্কার করছি আমার সত্যকে। যে-পথ আমার সত্যের বিরোধী, সে পথ আর কোনো পথই আমার বিপথ নয়। রাজভয়-লোকভয় কোনো ভয়ই আমায় বিপথে নিয়ে যাবে না। আমি যদি সত্যি করে আমার সত্যকে চিনে থাকি , আমার অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে , তাহলে বাইরের কোনো ভয়ই আমার কিছু করতে পারবে না। যার ভিতরে ভয়, সেই বাইরে ভয় পায়। অতএব যে মিথ্যাকে চেনে, সে মিছামিছি তাকে ভয়ও করে না। যার মনে মিথ্যা, সে-ই মিথ্যাকে ভয় করে। নিজকে

আমার পথ

চিনলে মানুষের মনে আপনা-আপনি এত বড় একটা জোর আসে যে, সে আপন সত্য ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করে না- অর্থাৎ কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না। এই যে, নিজকে চেনা, আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পথ প্রদর্শক কান্ডারি বলে জানা, এটা দম্ভ নয়, অহংকার নয়। এটা আত্মকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি।

আর যদি এটাকে কেউ ভুল কারে অহংকার বলে মনে করেন, তবু এটা মন্দের ভালো- অর্থাৎ মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভালো। অনেক সময় খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে নিজের সত্যকে অস্বীকার করে ফেলা হয়।

আমার পথ

ওতে মানুষকে ক্রমেই ছোট করে ফেলে, মাথা নিচু করে আনে। ও রকম বিনয়ের চেয়ে অহংকারের পৌরুষ অনেক-অনেক ভালো।

অতএব এই অভিশাপ-রথের সারথির স্পষ্ট কথা বলাটাকে কেউ যেন অহংকার বা স্পর্ধা বলে ভুল না করেন। স্পষ্ট কথা বলায় একটা অবিনয় নিশ্চয় থাকে। কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা। নিজকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস আসে। এই স্বাবলম্বন, এই নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস করতেই শেখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজি। কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝলাম না, "আমি অছি" এই তথ্য না বলে সবাই বলতে লাগলাম "গান্ধীজি আছেন"। এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললে।

একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কী করে? আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়। নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্য একজন মহাপুরুষকে প্রাণপণে ভক্তি করলেই যদি দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, তাহলে এই দেশ এতদিন পরাধীন থাকত না। আত্মকে চেনা নিজের সত্যকে বড় মনে করার দম্ভ-আর যাই হোক ভন্ডামি নয়। এ দম্ভ শির উঁচু করে, পুরুষ করে, মনে একটা 'ডোন্ট কেয়ার'-ভাব আনে। আর যাদের এই তথাকথিত দম্ভ আছে, শুধু তারাই অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

আমার পথ

যার ভিত্তি পচে গেছে, তাকে একদম উপড়ে ফেলে নতুন করে ভিত্তি না গাঁথলে তার ওপর ইমারত যতবার খাড়া করা যাবে, ততবারই তা পড়ে যাবে। দেশের যারা শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভন্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে প্রয়োজন হবে আগুনের সম্মার্জনা। আমার এমন গুরু কেউ নেই, যার খাতিরে সে আগুন-সত্যকে অস্বীকার করে কারুর মিথ্যা বা ভন্ডামিকে প্রশ্রয় দেবে। আমি সে-দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি কোনো দিনই কারুর বাণীকে বেদবাক্য বলে মেনে নেব না, যদি তার সত্যতা প্রাণে তার সাড়া না দেয়। না বুঝে বোঝার ভন্ডামি করে পাঁচ জনের শ্রদ্ধা আর প্রশংসা পাবার লোভ আমি কোনো দিনই করব না।

ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ বজায় রাখবার জন্যে ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেই দিনই নিভে যাবে। একমাত্র মিথ্যার জলই এই শিখাকে নিভাতে পারবে। তাছাড়া কেউ নিভাতে পারবে না।

মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। (হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা আমার এ পথের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল,

আমার পথ

সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কোনো হিংসার দুশমনির ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ্য করে এই আগুনের ঝান্ডা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম।

[সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত।

পাঠ-পরিচিতি

প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ 'রুদ্র-মঙ্গল' থেকে সংকলিত হয়েছে। "আমায় পথ প্রবন্ধে নজরুল এমন এক 'আমি'র আবাহন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ। সত্য প্রকাশে তিনি নির্ভীক অসংকোচ। তাঁর এই 'আমি'-ভাবনা বিন্দুতে সিন্ধুর উচ্ছ্বাস জাগায়। নজরুল প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ এক 'আমি'র সীমায় ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন। একইসঙ্গে, এক মানুষকে আরেক মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে 'আমরা' হয়ে উঠতে চেয়েছেন। স্বনির্ধারিত এই জীবন-সংকল্পকে তিনি তাঁর মতো আরও যারা সত্যপথের পথিক হতে আগ্রহী তাদের উদ্দেশে ছড়িয়ে দিতে চান।

আমার পথ

এই সত্যের উপলব্ধি কবির প্রাণপ্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। তিনি তাই অনায়াসে বলতে পারেন, 'আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য।' রুদ্র-তেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে নজরুলের এই 'আমি' সত্তা। তাঁর পথনির্দেশক সত্য অবিনয়কে মেনে নিতে পারে কিন্তু অন্যায়কে সহ্য করে না। সমাজ ও সমকাল পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক দেখেছেন যে, সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরি হয় পরনির্ভরতা, আহত হয় আমাদের ব্যক্তিত্ব। নজরুলের কাছে এই ভগ্ন আত্মবিশ্বাসের গ্লানি গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরিবর্তে তিনি প্রয়োজনে দাম্ভিক হতে চান।

কেননা তাঁর বিশ্বাস- সত্যের দম্ভ যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের পক্ষেই কেবল অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। নজরুল এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, তিনি ভুল করতে রাজি আছেন কিন্তু ভন্ডামি করতে প্রস্তুত নন। ভুল জেনেও তাকে ঠিক বলে চালিয়ে দেবার কপটতা কিংবা জেদ তাঁর দৃষ্টিতে ভন্ডামি। এই ভুল ব্যক্তির হতে পারে, সমাজের হতে পারে কিংবা হতে পারে কোনো প্রকার বিশ্বাসের। তবে তা যারই হোক আর যেমনই হোক এর থেকে বেরিয়ে আসাই নজরুলের একান্ত প্রত্যাশা। তিনি জানেন, এই বেরিয়ে আসা সম্ভব হলেই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণের সম্মিলন ঘটানো সম্ভব হবে। মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত হতে পারলেই ধর্মের সত্য উন্মোচিত হবে, এক ধর্মের সঙ্গে অপর

ধর্মের বিরোধ মিটে যাবে। সম্ভব হবে গোটা মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা। আর এই ঐক্যের মূল শক্তি হলো সম্প্রীতি। এই সম্প্রীতির বন্ধন শক্তিশালী হলে মানুষের মধ্যে সহনশীলতা বাড়ে। ভিন্ন ধর্ম-মত-পথের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগে। আর এই সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে উৎকৃষ্ট মানব সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

MCQ

❑ "আমার যাত্রা শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি নমস্কার করছি আমার সত্যকে" আলোচ্য বাক্যে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সত্যনিষ্ঠতা

খ. ন্যায়পরায়ণতা

গ. অসাম্প্রদায়িক চেতনা

ঘ. নীতিবোধ

আমার পথ

- . কোন ভয়ে প্রাবন্ধিক ভীত নন বলে 'আমার পথ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন?

ক. রাজভয় খ. শত্রুভয়

গ. ভূতের ভয় ঘ. সমাজের ভয়

- বাইরের ভয় কখন মানুষকে কিছু করতে পারে না?

ক. মিথ্যাকে ধ্বংস করতে পারলে খ. মিথ্যার সাথে আপোষ করলে

গ. সত্যের পথে অবিচল থাকলে ঘ. অন্তরের সত্যকে চিনতে পারলে

❑ কে বাইরে ভয় পায়?

ক. যে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয়
খ. যার ভেতরে ভয়
গ. যার আত্মবিশ্বাস নেই
ঘ. যার সাহস কম

❑ কার আর কাউকে চিনতে বাকি থাকে না?

ক. যে তার সমাজকে চেনে
খ. যে গোটা পৃথিবীটাকেই চেনে
গ. যে শত্রুকে চেনে
ঘ. যে নিজেকে চেনে

❑ মানুষ কীভাবে নিজ মনের মধ্যে জোর অনুভব করে?

ক. নিজেকে চেনার মাধ্যমে

খ. পুণ্যের পথকে চেনার মাধ্যমে

গ. মনুষ্যত্ববোধ অর্জনের মাধ্যমে

ঘ. অপরের কল্যাণসাধনের মাধ্যমে

❑. “শ্রেয়া সব সময় তার অফিসের বড় কর্তার সামনে মাথা হেঁট করে থাকে। এমনকি বড়কর্তা তাকে শত অপমান করলেও সে তা গায়ে মাখে না।” ‘আমার পথ’ প্রবন্ধ অনুসারে উদ্দীপকের শ্রেয়ার কোনটিকে অস্বীকার করেছে?

ক. ব্যক্তিত্ববোধকে
খ. বিবেকবোধকে
গ. আত্মসম্মানকে
ঘ. আপন সত্যকে

- ‘আমার পথ’ প্রবন্ধ অনুসারে কীভাবে মানুষ ক্রমেই নিজেকে ছোট করে ফেলে?

ক. খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে
খ. খুব বেশি আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে
গ. খুব বেশি মহত্ত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে
ঘ. খুব বেশি সহানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে

- কোনটি মানুষের মাথা নিচু করে ফেলে বলে প্রাবন্ধিক 'আমার পথ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন?

ক. খুব বেশি বিনয় প্রকাশ
খ. খুব বেশি অহংকার প্রকাশ
গ. খুব বেশি সহনশীলতা প্রকাশ
ঘ. খুব বেশি নম্রতা প্রকাশ

- কোন ধরনের কথা বলায় একটা অবিনয় নিশ্চয় থাকে?

ক. মিথ্যা
খ. স্পষ্ট
গ. অসত্য
ঘ. অস্পষ্ট

- কার স্পষ্ট কথাটাকে কেউ যেন অহংকার বলে ভুল না করে বসেন বলে 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন?

ক. মহারথীর

খ. কর্ণধারের

গ. দিকনির্দেশকের

ঘ. অভিশাপরথের সারথির

- কিসে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা?

ক. মিথ্যা বলায় যে অবিনয় থাকে তাতে

খ. সত্যের সাথে মিথ্যার বিরোধ

গ. অস্পষ্ট কথা বলায় যে অবিনয় থাকে তাতে

ঘ. স্পষ্ট কথা বলায় যে অবিনয় থাকে তাতে

- কখন নিজের সত্যের ওপর অটুট বিশ্বাস আসে?

ক. সবাইকে ভালোবাসলে
খ. নিজের সত্যকে কর্ণধার মনে জানলে
গ. কাউকে ভয় না পেলে
ঘ. চিত্তের দৃঢ়তা অর্জন করলে

- কে সবাইকে নিজের ওপর বিশ্বাস করতে শিখাচ্ছিলেন বলে ‘আমার পথ’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন-

ক. নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু
খ. জওহরলাল নেহেরু
গ. ইন্দিরা গান্ধী
ঘ. মহাত্মা গান্ধী

- কারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পায় না?

ক. যারা কপট আচরণ করে

খ. যাদের অন্তরে সত্যের স্থান নেই

গ. যাদের অন্তরে গোলামির ভাব

ঘ. যারা আলসেমি করে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ‘রাজবন্দির জবানবন্দি’ গ্রন্থটির লেখকের নাম কী?
- কত খ্রিস্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করেন?
- কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
- কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
- কাজী নজরুল ইসলামের মতে কে মিথ্যাকে ভয় করে?
- কাজী নজরুল ইসলামের মতে, কাকে চিনলে আর কাউকে চিনতে বাকি থাকে না?

আমার পথ

- কী চিনলে মানুষের মনে আপনা-আপনি একটা জোর আসে?
- 'কুর্নিশ' শব্দের অর্থ কী?
- কী করতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হয়?
- সমাজের নিয়ম পাল্টাতে গেলে কাদের আক্রমণের শিকার হতে হয়?
- 'মেকি' শব্দের অর্থ কী?
- 'সম্মার্জনা' শব্দের অর্থ কী?
- 'আগুনের ঝান্ডা' শব্দটির অর্থ কী?
- দেশের শত্রুকে দূর করতে কী প্রয়োজন?

শব্দার্থ ও টীকা

কর্ণধার- নেতৃত্ব প্রদানের সামর্থ্য আছে এমন ব্যক্তি।

কুর্নিশ- অভিবাদন। সম্মান প্রদর্শন।

অভিশাপ-রথের সারথি- সমাজের নিয়ম পাল্টাতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সমাজরক্ষকদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। এ কথা জেনেও নজরুল তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অভিশাপ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। নিজেই বসেছেন রথচালক তথা সারথির আসনে।

মেকি- মিথ্যা। কপট।

সম্মার্জনা- ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা।

আগুনের ঝান্ডা- অগ্নিপতাকা। আগুনে সব শুদ্ধ করে নিয়ে সত্যের পথে ওড়ানো নিশান।

ফোকাস
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং

ফোকাস
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং

ফোকাস
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং

ফোকাস
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং

তাহারেই পড়ে মনে

সুফিয়া কামাল
(২০শে জুন ১৯১১ - ২০শে নভেম্বর ১৯৯৯)

বিষয়বস্তু

প্রিয়জন হারানোর বিরহ-বেদনা

ফোকাস
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং

তাহারেই পড়ে মনে

মূল বাণীঃ- বিষাদময় রিক্ততার সুর

মোট লাইন — ৩০টি	স্তবক-৫ টি
কবি-৫ বার	কহিলাম-৪ বার
মাস-মাঘ, ফাল্গুন	ফাল্গুন-৩ বার, বসন্ত-৪ বার
ফুল-মাধবী, বাতাবি নেবু, আমের মুকুল	ঋতু- ২টি শীত, বসন্ত

কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের বিশিষ্ট মহিলা কবি ও নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর জন্ম ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ২০এ জুন বরিশালে। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়। কবির পিতার নাম সৈয়দ আবদুল বারী এবং মায়ের নাম সাবেরা বেগম । যে সময়ে সুফিয়া কামালের জন্ম তখন বাঙালি মুসলমান নারীদের কাটাতে হতো গৃহবন্দি জীবন । স্কুল কলেজে পড়ার কোনো সুযোগ তাদের ছিল না। ওই বিরুদ্ধ পরিবেশে সুফিয়া কামাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি। পারিবারিক নানা উত্থান পতনের মধ্যে তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। তারই মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। পরবর্তীকালে সাহিত্য সাধনা ও নারী আন্দোলনে ব্রতী হয়ে তিনি শুধু কবি হিসেবেই বরণীয় হননি, জননী সম্ভাষণে ভূষিত হয়েছেন।

তাহারেই পড়ে মনে

সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : ‘সাঁঝের মায়া’, ‘মায়া কাজল’, ‘কেয়ার কাঁটা’, ‘উদাত্ত পৃথিবী' ইত্যাদি । এছাড়াও তিনি গল্প, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তিনি । সুফিয়া কামাল ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০এ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন ।

মূল কবিতা

তাহারেই পড়ে মনে

"হে কবি! নীরব কেন-ফাল্গুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?"
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি-
"দখিন দুয়ার গেছে খুলি?
বাতাবী নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?"
"এখনো দেখনি তুমি?" কহিলাম "কেন কবি আজ
এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?"

নিঃ+রব
উৎসুক চাহনি
বিসর্গ সন্ধি

তাহারেই পড়ে মনে

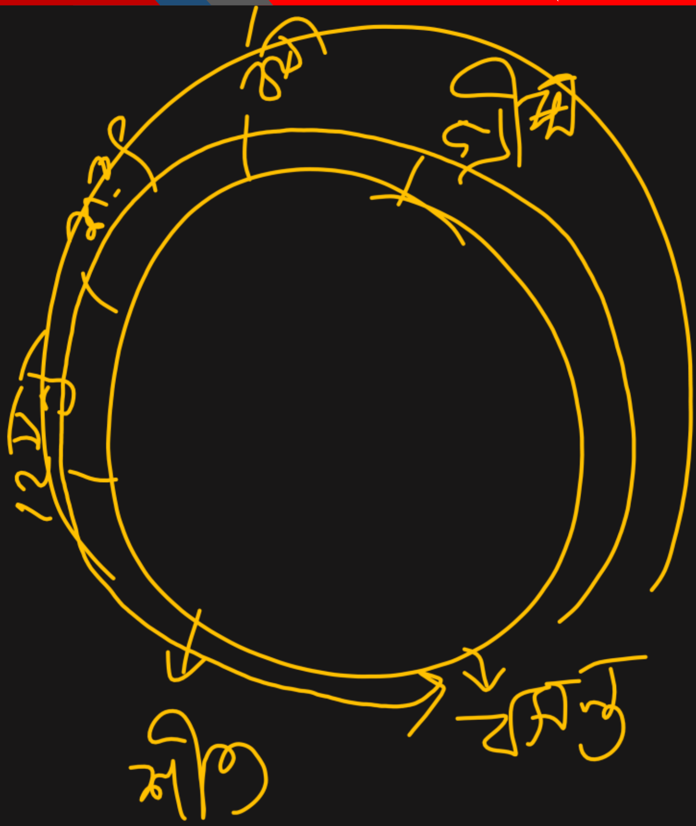

কহিল সে সুদূরে চাহিয়া-
"অলখের পাথার বাহিয়া
তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?
ডেকেছে কি সে আমারে? -শুনি নাই,রাখিনি সন্ধান।"
কহিলাম "ওগো কবি, রচিয়া লহ না আজও গীতি,
বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি-এ মোর মিনতি।"
কহিল সে মৃদু মধুস্বরে-
"নাই হ'ল, না হোক এবারে-

তাহারেই পড়ে মনে

আমার গাহিতে গান! বসন্তরে আনিতে ধরিয়া-
রহেনি,সে ভুলেনি তো, এসেছে তো ফাল্গুন স্মরিয়া।"
কহিলাম "ওগো কবি, অভিমান করেছ কি তাই?
যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।"
কহিল সে পরম হেলায়-
"বৃথা কেন? ফাগুন বেলায়
ফুল কি ফোটে নি শাখে? পুষ্পারতি লভে নি কি ঋতুর রাজন?
মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করে নি সে অর্ঘ্য বিরচন?"

তাহারেই পড়ে মনে

"হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?"
কহিলাম "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?"
কহিল সে কাছে সরি আসি-
"কুহেলী উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী-
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে। তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোন মতে।"

তাহারেই পড়ে মনে

মূলভাব

- "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতাটি ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসিক মোহাম্মাদী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
- এ কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে।
- সাধারণভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য মানবমনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস।
- বসন্ত-প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য যে কবিমনে আনন্দের শিহরণ জাগাবে এবং তিনি তাকে ভাবে ছন্দে সুরে ফুটিয়ে তুলবে সেটাই প্রত্যাশিত।

তাহারেই পড়ে মনে

- কিন্তু কবিমন যদি কোন কারণে শোকাচ্ছন্ন কিংবা বেদনা ভারাতুর থাকে তবে বসন্ত তার সমস্ত সৌন্দর্য সত্ত্বেও কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারবে না।
- এ কবিতায় কবির ব্যক্তি জীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপথ ঘটেছে।
- তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে (১৯৩২) কবির জীবন প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে।
- তার ব্যক্তিজীবন ও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে এক বিষণ্নতা।
- কবিমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় রিক্ততার হাহাকারে।

তাহারেই পড়ে মনে

- "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতাকে আচ্ছন্ন করে আছে এই বিষাদময় রিক্ততার সুর।
- তাই বসন্ত এলেও উদাসীন কবির অন্তর জুড়ে রিক্ত শীতের করুণ বিদায়ের বেদনা।
- কবিতাটির আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর নাটকীয়তা।
- গঠনরীতির দিক থেকে একটি সংলাপনির্ভর রচনা।
- কবিতার আবেগময় ভাববস্তুর বেদনাঘন বিষণ্নতার সুর এবং সুললিত ছন্দ এতই মাধুর্যমণ্ডিত
- যে তা সহজেই পাঠকের অন্তর ছুঁয়ে যায়।

MCQ

- বাংলাদেশের শ্রেষ্ট মহিলা কবির নাম কী?

ক. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
খ. সুফিয়া কামাল
গ. সেলিনা হোসেন
ঘ. নীলিমা ইব্রাহিম

- সুফিয়া কামালের যখন জন্ম হয় তখন মুসলমান নারীরা কীভাবে দিন কাটাত?

ক. আলসেমি করে
খ. হেসেখেলে
গ. গৃহবন্দি অবস্থায়
ঘ. স্বাধীনভাবে

তাহারেই পড়ে মনে

- ‘সাঁঝের মায়া’ কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?

ক. সুফিয়া কামালের খ. বেগম রোকেয়ার
গ. কামিনী রায়ের ঘ. স্বর্ণকুমারী দেবীর

- ‘মায়া কাজল’ কোন জাতীয় রচনা?

ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. কাব্য ঘ. ছোটগল্প

তাহারেই পড়ে মনে

- সুফিয়া কামাল কী হিসেবে ভূষিত হয়েছেন?

ক. জননী সম্ভাষণে খ. পদ্মভূষণে
গ. মহিয়সী ঘ. আলো হাতে নারী

- 'উদাত্ত পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থটি কার রচনা?

ক. বেগম রোকেয়ার খ. সুফিয়া কামালের
গ. জাহানারা ইমামের ঘ. কামিনী রায়ের

তাহারেই পড়ে মনে

❑ 'ইতল বিতল' সুফিয়া কামালের কী জাতীয় রচনা?

ক. স্মৃতিকথা খ. ভ্রমণকাহিনি
গ. শিশুতোষ ঘ. কল্পকাহিনি

❑ কবি সুফিয়া কামাল কবে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে খ. ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে
গ. ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ঘ. ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে

- কবি সুফিয়া কামাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক. কুমিল্লায় খ. পাবনায়
গ. বরিশাল ঘ. নোয়াখালি

- কবি সুফিয়া কামাল কবে মৃত্যুবরণ করেন?

ক. ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে খ. ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে
গ. ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ঘ. ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে

তাহারেই পড়ে মনে

- কবি সুফিয়া কামাল কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

ক. কুমিল্লায় খ. পাবনায়

গ. ঢাকায় ঘ. বরিশালে

- "এমন উন্মনা তুমি?" এটি কার উক্তি?

ক. কবির খ. কবিভক্তের

গ.কবির স্বামীর ঘ.কবির ছেলের

তাহারেই পড়ে মনে

জ্ঞানমূলক

- মাঘের সন্ন্যাসী’ কাকে বলা হয়েছে?
- ‘উন্মনা’ শব্দের অর্থ কী?
- সুফিয়া কামালের জন্মসাল-
- সুফিয়া কামাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
- সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কোথায়?
- সুফিয়া কামাল কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কোন ঋতুর আগমনের কথা বলা হয়েছে?

তাহারেই পড়ে মনে

- ‘কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি’-কার আঁখি?
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির নীরবতার কারণ কী?
- মাঘের সন্ন্যাসী কোথায় চলে গেছে?
- ‘পুষ্পারতি’ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
- ‘অর্ঘ্য বিরচন’ অর্থ কী?
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
- সুফিয়া কামালের স্বামীর নাম কী?
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি কোন ছন্দে লেখা?

তাহারেই পড়ে মনে

তাহারেই পড়ে মনে

সমাপ্ত